

নাগরিকত্ব নিয়ে নয়া তামাশা

নাগরিকত্ব নিয়ে নাগরিক হেনস্থা বেড়েই চলেছে। সুমন মোল্লা নামে এক ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে জানিয়েছেন, ১৮ জুন তাঁর ভাইকে বেআইনি ভাবে তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। তাঁর নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংকের বই, দাদুর জমির দলিল সহ যাবতীয় কাগজ দেওয়ার পরেও কলকাতা হাইকোর্ট সম্প্রতি এই মামলার বিচার প্রসঙ্গে বলেছে, এগুলি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। হাইকোর্ট পরিস্কার বলেই দিয়েছে, নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে আটক ব্যক্তিকেই। আদালত বা রাষ্ট্রের এখানে কিছু করার নেই (বর্তমান ৩০ জুলাই, ২০২৬)। উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের সাহিদা বিবি কিন্তু তাঁর যাবতীয় নথি জমা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রের কর্তাদের কাছে। অথচ শুনানিতে তাঁকে ডাকাই হয়নি। ইতিমধ্যে মুম্বাই পুলিশ এবং বিএসএফ তাঁকে আসাম সীমান্ত দিয়ে ঠেলে দিয়েছে বাংলাদেশে। নাগরিক হয়েও, নাগরিকত্বের প্রমাণ হাতে নিয়েও তিনি এখন ভিনদেশে অন্য এক সহদয় পরিবারের আশ্রয়ে *সাতের পাতায় দেখুন*

বিজেপি মতাদর্শগত ভাবেই নেতাজির চিন্তা ও কর্মের বিরোধী

এই সেই মাটি যা ভারতের নবজাগরণের সূতিকাগার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপসহীন সংগ্রামের রক্তস্নাত প্রাঙ্গণ এবং প্রগতিশীল, বামপন্থী চিন্তা-চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সম্প্রতি এক অদ্ভুত ও বিপজ্জনক আত্মফালনের সাক্ষী থাকছে এই রাজ্য। বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ যেন বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের নেতাদের মাথা এমনভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে যে, তাঁরা ‘ধরাকে সরা জ্ঞান’ করছেন। ক্ষমতার তীব্র অহমিকায় তাঁরা আঘাত হানতে চাইছেন বাংলার সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গায়, বাংলার ইতিহাস এবং মনীষীদের আত্মপরিচয়ের ওপর। বিশেষত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি সংঘ পরিবারের ধারাবাহিক কুৎসা ও অবমাননা প্রমাণ করছে, এদের লক্ষ্য নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নয়, বরং এই মাটির প্রগতিশীল

চেতনাকে, নবজাগরণের ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করা। নেতাজির প্রতি এই অবমাননা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, *দুয়ের পাতায় দেখুন*

ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগীরাই দেশপ্রেমের পাঠ শেখাচ্ছে

দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ করাতে মুখ্যমন্ত্রী যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, সে সম্পর্কে রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১১ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, নতুন প্রজন্মকে দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ করাতে ১৩ ও ১৪ আগস্ট যে কর্মসূচির কথা মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য প্রশাসন ঘোষণা করেছে, তা আসলে দেশভাগের প্রকৃত ইতিহাসকে *দুয়ের পাতায় দেখুন*

ইজরায়েলের গণহত্যার রক্ত লেগে ভারতের কোম্পানির হাতেও

অনেক দেরিতে হলেও রাষ্ট্রসংঘ নিযুক্ত ‘ইউএন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন অফ এনকোয়ারি’ বিচারপতি এস মুরলিধরের নেতৃত্বে অনুসন্ধান করে রায় দিয়েছে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েল যা করেছে তাকে বলা উচিত ‘গণহত্যা’। এই রায়ের এক মাস বাদে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি রিপোর্টে বলেছে গণহত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্রের অনেকটাই এসেছে ভারতীয় কোম্পানি থেকে, যার মধ্যে আছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোম্পানিও। ফলে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, জাতি বিদ্বেষ, গণহত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের সাথে ভারত রাষ্ট্রের নাম জড়িয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যদিও ভারতের মানুষ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই পথে নেমেছে।

অ্যামনেস্টির রিপোর্ট ‘মোড ইন ইন্ডিয়া : দ্য সাপ্লাই অফ ওয়েপনস অ্যান্ড অ্যামুনিশনস টু ইজরায়েল’-এ বলা হয়েছে ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে ২,৫৯৬ দফায় ভারত থেকে ইজরায়েলে কামানের গোলা, মেশিনগানের যন্ত্রাংশ, বিস্ফোরক, ড্রোনে ব্যবহৃত অস্ত্র, ছোট আগ্নেয়াস্ত্র সহ নানা ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। এর বড় অংশই পাঠানো হয়েছে ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীকে অস্ত্র জোগানোর সংস্থাগুলির কাছে সরাসরি। অ্যামনেস্টির সহসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেছেন, গাজার ঘটনা সারা বিশ্বের সামনে আসার পরে এবং আন্তর্জাতিক আদালতের মনোভাব জনার পরেও মোদি সরকার এই সরবরাহ বন্ধ করেনি। অ্যামনেস্টি এই বিষয়ে ভারত সরকারকে এবং অস্ত্র সরবরাহকারী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোম্পানিগুলিকে চিঠি পাঠালেও তারা কোনও উত্তর দেয়নি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের মতে ভারত-ইজরায়েল প্রতিরক্ষা চুক্তি ও মার্কিন সহযোগী হিসাবে দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্ক থাকলেও গণহত্যা সম্পর্কিত জেনোভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী হিসাবে ভারত সরকারের উচিত ছিল গণহত্যার অভিযোগকে বিবেচনায় রাখা।

গাজা ভূখণ্ড সহ প্যালেস্টাইনে ইজরায়েল কতটা বর্বর হত্যালীলা চালিয়েছে তা আজ দুনিয়ার কারও অজানা নয়। লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা, বেছে বেছে শিশুদের ওপর আক্রমণ, হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মস্থান, সাধারণ মানুষের বসতি সহ সমস্ত *চারের পাতায় দেখুন*

যন্তুর মন্তুর থেকে জয়পাল সিং মুণ্ডা স্টেডিয়াম রাঁচি উত্তাল ছাত্র-যুব আন্দোলনে

২৯ জুলাই। রাঁচির জয়পাল সিং মুণ্ডা স্টেডিয়াম। সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। তাঁদের হাতে প্ল্যাকার্ড, গলায় স্লোগান, চোখে ক্ষোভ আর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। জেপিএসসি, জেএসএসসি, সিজিএল

সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় প্রস্তুতপত্র ফাঁস, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনার বিরুদ্ধে ওই স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ধরনার মধ্য দিয়ে সে দিন যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, মাত্র

কয়েক দিনে তা রূপ নিয়েছে এক বৃহত্তর ছাত্র-যুব গণআন্দোলনে। উল্গুলানের মহানায়ক বিরসা মুণ্ডার জন্মভূমিতে যেন আবারও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিরোধের সেই আহ্বান। *সাতের পাতায় দেখুন*



রাঁচিতে ছাত্র-যুব বিক্ষোভকারীরা

বাঁকুড়ার ইন্দাসের ঘটনা ও যাদবপুরে লেনিন মূর্তি ভাঙার অপচেষ্টার নিন্দা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৬ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, বাঁকুড়ার ইন্দাসের শেখ আব্দুল হাফিজ গ্রামের প্রাথমিক স্কুল সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলেন বলে তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিককে বিজেপির দুষ্কৃতীরা পিটিয়ে খুন করেছে। উল্লেখ্য, আব্দুল দিল্লিতে ছাত্র-যুবদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অন্য দিকে যাদবপুরে লেনিন মূর্তি ভাঙার অপচেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি-আরএসএস দুষ্কৃতীরা। ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এগুলো কি সেই সুশাসনের নমুনা? তিনি বলেন, আমরা অবিলম্বে রাজ্য জুড়ে এই দুষ্কৃতী-রাজ বন্ধের দাবি করছি। পাশাপাশি বাঁকুড়ার ঘটনায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

বিজেপি নেতাজির চিন্তা ও কর্মের বিরোধী

একের পাতার পর

এটি একটি সুপরিচালিত রাজনৈতিক নকশার অংশ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রীমতী ভট্টাচার্য যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের নাম করে পরোক্ষ নেতাজিকে নিশানা করে গুন্ডামির অভিযোগ তোলেন, তখন তার মর্মার্থ বুঝতে বাংলার মানুষের অসুবিধা হয় না। এরপর শুরু হয় নেতাজিকে অপমানের ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা। বীরভূমের রামপুরহাটে বিজেপি বিধায়কের উপস্থিতিতে ‘নেতাজি সুভাষ রোড’-এর নাম বদলে দেওয়া হয় ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড’-এ। নির্লজ্জতার সীমা পার করেন বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ অনন্ত মহারাজ, যিনি নেতাজিকে ‘যুদ্ধাপরাধী’ আখ্যা দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর প্রশ্রিত ভূমিকাকে কালিমালিপ্ত করার ধৃষ্টতা দেখান। কোথাও গায়ের জোরে নেতাজির মূর্তিকে গেরুয়া পতাকায় মুড়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও রাতের অন্ধকারে মূর্তি ভাঙচুর চলছে, আবার বিজেপির আইটি সেল নেতাজির নামে কুরুচিকর মিম ও পোস্ট ছড়াচ্ছে।

যে রাজনৈতিক শক্তি দাবি করে যে তারাই দেশের ‘একমাত্র দেশপ্রেমিক’ এবং বাকিরা ‘দেশদ্রোহী’, তাদের এই আচরণে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এদের আক্রমণ শুধু নেতাজিতেই থেমে নেই, রামমোহন রায় থেকে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবজাগরণের কোনও মনীষীই এদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেহাই পাননি। ইতিহাসের পাতা ওপ্টালে অবশ্য দেখা যায়, অতীতে জাতীয় কংগ্রেস এবং তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিও নেতাজির দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, কিছু ব্যঙ্গাত্মক কার্টুনও আঁকা হয়েছিল। কিন্তু আজকের বিজেপির আক্রমণ তার সমস্ত মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। বিজেপির রাজনৈতিক আদর্শটাই নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী। তাদের এই আক্রমণ চরম ইতিহাস বিকৃতি ও ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের নামান্তর।

দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ আকাশ থেকে পড়ে না। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ধরেই এই বোধ গড়ে উঠেছিল। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সচেতন ভাবে শতহস্ত দূরে ছিল। আরএসএস-এর তাত্ত্বিক প্রধান এম এস গোলওয়ালকর তাঁর ‘বান্ধব অফ থটস’ গ্রন্থে স্পষ্ট লিখেছিলেন যে, ‘ব্রিটিশ-বিরোধিতা ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীলতা’।

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন বা ১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়ে’ আন্দোলনের মতো গণঅভ্যুত্থানে হিন্দু মহাসভা বা আরএসএস অংশ তো নেয়নি, উল্টে এই সংগ্রামকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছিলেন, ‘গত তিন মাসের মধ্যে যে সব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতালাভে সহায়তা হবে বলে আমি মনে করি না।’ শুধু তাই নয়, বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি অর্থাৎ ব্রিটিশদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার পক্ষেও সওয়াল করেছিলেন তিনি। হিন্দু মহাসভার আরেক নেতা সাভারকরও বিয়াল্লিশের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের সহযোগিতা করতে এবং মুসলিমবিরোধী প্রচার তীব্র করতে নির্দেশ দেন। এই সাভারকরই আন্দামানে সেলুলার জেল থেকে ব্রিটিশদের কাছে মুচলেকা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি কোনওদিন ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত হবেন না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এ সব কি তাঁদের দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধের নমুনা!

যাঁদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের পরতে পরতে ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি আনুগত্য এবং আপসকামিতার এই ইতিহাস জড়িয়ে আছে, তারা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল বা সুভাষচন্দ্রকে চিনবে কী করে? দেশসেবার নামে আত্মসেবা এবং দেশবাসীর স্বার্থ রক্ষার আড়ালে কতিপয় ধনিক-পুঁজিপতি শ্রেণির

পকেট ভরানোই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বা নেতাজির আত্মত্যাগের মর্মার্থ বুঝবে না, এটাই তো স্বাভাবিক।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘দেশসেবা’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘দেশসেবা কথার কথা নয় দেশসেবা মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা। ... যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ সব যে দেশের জন্য বলি দিতে পারবে, দেশসেবা তার দ্বারাই হবে।’ সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে দেশসেবা আক্ষরিক অর্থে এমনই ছিল। আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েও এক নিশ্চিন্ত, বিলাসবহুল জীবনের মোহ ত্যাগ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে। তাই আজও তিনি আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ে ‘নেতাজি’ হয়েই অধিষ্ঠিত।

নেতাজির প্রতি এই অবমাননায় বাংলার জনমানসে যে তীব্র ক্ষোভের আগুন জ্বলছে, তা আঁচ করতে পেরেই তড়িঘড়ি ভাবমূর্তি রক্ষার মরিয়া চেষ্টায় নামেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি। মুখ্যমন্ত্রী কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি কার্যালয়ে নেতাজির ছবি বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেন এবং ডিজি ও সাইবার সেলকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তাঁদের এই চেষ্টার উদ্দেশ্যের জন্য বাংলার মানুষের প্রতিবাদ ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

নেতাজির মতো যুগনায়কের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যদি পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়, তবে স্বাধীন দেশে এই মেরুদণ্ডহীন প্রশাসনের চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে! শুধুমাত্র অনন্ত মহারাজের বঙ্গবিভূষণ সম্মান কেড়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

সবচেয়ে মর্মান্তিক হল মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণা, যেখানে তিনি বলেছেন প্রতিটি বিধানসভায় ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবাকেন্দ্র’ চালু করতে হবে এবং সেখানে ধূতি-পাঞ্জাবি পরিহিত নেতাজির ছবি রাখলে তবেই কেন্দ্র পরিচালনার জন্য মাসে ৩০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই ফতোয়ার সঙ্গে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী চেষ্টার কোনও সম্পর্ক আছে কি?

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি এই ধারাবাহিক অবমাননা বাংলা তথা ভারতবর্ষ মেনে নেয়নি, নেবেও না। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছাত্র, যুব, মহিলা ও সাধারণ মানুষ যেভাবে রাজপথে নেমে মিছিল, সভা ও সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন, তা প্রমাণ করে যে দেশের প্রগতিশীল ও বামপন্থী চেষ্টা আজও অগ্নান।

ক্ষমতার মদমত্ততায় কেউ নেতাজির মূর্তিতে গেরুয়া বান্ডা লাগাতে পারে, রাতের অন্ধকারে মূর্তিতে কালি লেপে দিতে পারে, এমনকি মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়েও দিতে পারে। কিন্তু এ সবের দ্বারা নবজাগরণের যুক্তিবাদী চিন্তা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই আপসহীন বিপ্লবী আদর্শের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটা যাবে না। নেতাজি কোনও জড়মূর্তি নন, তিনি মুক্তিকামী মানুষের অন্তরে এক জীবন্ত আদর্শ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের আদর্শগত লড়াইয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেই চলবেন। ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র আজকের বিজেপির পূর্বসূরী হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে বলেছিলেন, “সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের হিন্দু মহাসভা ত্রিশূল হাতে ভোটভিক্ষায় পাঠিয়েছে। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দুমায়েই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন। তাঁদের কথা কেউ শুনবেন না...”। এ কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হবে, নেতাজি চর্চার বিকাশ মতাদর্শগত ভাবেই আরএসএস-বিজেপি চায় না, চাইতে পারে না কেন তাও বুঝতে হবে।

আসুন, সংঘ পরিবারের এই বিকৃত ইতিহাসের বিরুদ্ধে আমরা প্রকৃত ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটাই। নবজাগরণের মনীষী আর বিপ্লবীদের আদর্শকে কেবল ভক্তির মোড়কে না রেখে দৈনন্দিন জীবন ও লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলি।

জীবনাবসান

বীরভূমের রামকৃষ্ণপল্লীতে দলের প্রবীণ সমর্থক কমরেড নবগোপাল ব্যানার্জী বার্ষিক্যজনিত অসুস্থতায় ২৯ জুলাই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

কমরেড নবগোপাল ব্যানার্জী ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে কর্মরত অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। পার্টি নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে দলের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক ফ্রন্টের এবং পার্টির কাজেও যুক্ত হন। নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা, নিয়মিত দলের মুখপত্র, পত্র-পত্রিকা জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মসূচি রূপায়ণেও ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ১৯৯৬ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি সিউড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তখন থেকেই তিনি পার্টি অফিস এবং সেন্টারে নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন, স্থানীয় কর্মসূচিতেও অংশ নিতেন। শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়লেও নিয়মিত গণদাবী, পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়তেন। দলের খোঁজখবর নিতেন, পুরনো দিনের কমরেডদের সংগ্রামের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরে নতুন কর্মীদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ সমর্থককে হারাল।

কমরেড নবগোপাল ব্যানার্জী লাল সেলাম



মালদায় মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

মিড ডে মিলের দায়িত্ব মিড ডে মিল কর্মীদের হাতেই তুলে দেওয়া এবং ১২ মাসের বেতন, উৎসব ভাতা, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের সমান মজুরি সহ ১০ দফা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে ১৩ আগস্ট মালদায় কয়েক হাজার মিড ডে মিল কর্মী বিক্ষোভ মিছিলে शामिल হলেন।

স্লোগান মুখরিত এই মিছিল রথবাড়ি থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিগ্রহ করে ডিএম দপ্তরে পৌঁছয় এবং সেখানে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন এবং রথবাড়িতে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভানেত্রী সুনন্দা পণ্ডা, সংগঠনের মালদা জেলা সম্পাদিকা সাথী চৌধুরী, জেলা সভানেত্রী রৌশন আরা বেগম, মাজেদা বিবি, মেনকা সরকার ও রেখা ওরাওঁ।

ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগীরাই দেশপ্রেমের পাঠ শেখাচ্ছে

একের পাতার পর

গোপন করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। দেশভাগ অবিভক্ত ভারতের সাধারণ মানুষ চাননি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি নিয়েছিল, তাকেই একদিকে হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস এবং অন্য দিকে মুসলিম লিগ দ্বিজাতি তত্ত্বের নামে শক্তিশালী করেছিল। তাদের এই বিভেদকামী ভূমিকার পাশাপাশি কংগ্রেস নেতাদের দ্রুত ক্ষমতার গদিতে বসার লোভের পরিণামেই দেশভাগ হয়েছে। যে বিজেপির পূর্বসূরী আরএসএস-হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশ বিরোধিতাকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলতে রাজি হয়নি এবং ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, গোটা স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বে ব্রিটিশকে সহযোগিতার নীতি নিয়ে চলেছে, তারাই আজ দেশের ছাত্র-যুবদের দেশপ্রেমের পাঠ শেখাচ্ছে। এর থেকে বড় ট্রাজেডি আর কী হতে পারে!

আমরা সরকারের এই ইতিহাসের বিকৃতি ও বিভেদকামী কর্মসূচি বাতিল করে জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী কাজে মনোনিবেশ করার দাবি জানাচ্ছি।

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, ‘কনফেশন অফ ফেথ’। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মাস্ত্রাকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার উপর একটু ভাবনা-চিন্তা করো। আমার মনে হয়, এ ভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত ‘কমিউনিস্ট ইস্তাহার’। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মাস্ত্র-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করছি। এ বার তৃতীয় কিস্তি।

প্রশ্ন : শিল্প-বিপ্লব এবং বুর্জোয়া আর সর্বহারার মধ্যে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার তাৎক্ষণিক ফলাফল কী হয়েছিল ?

উত্তর : প্রথমত, যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ফলে শিল্পজাত দ্রব্য সমানে সস্তা হয়ে যেতে থাকল। ফলে, কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে চলা ক্ষুদ্র উৎপাদন শিল্পের (ম্যানুফ্যাক্চারি) পুরনো প্রণালীটা পৃথিবীর সমস্ত দেশে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। যে সব অর্ধসভ্য (সেমি বারবারিয়ান) দেশ তখনও পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক অগ্রগতির ধারা থেকে কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তাদের উৎপাদন পদ্ধতি তখনও পুরনো উৎপাদন প্রণালীতে চলত, তাদের বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হল। ব্রিটিশের অপেক্ষাকৃত সস্তা পণ্যদ্রব্য কেনার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষুদ্র উৎপাদন-শ্রমিকদের ধ্বংস হয়ে যেতে দিতে হল তাদের। হাজার হাজার বছরেও যে সব দেশে প্রগতির চিহ্ন দেখা যায়নি— যেমন, ভারতবর্ষ— সেখানেও আগাগোড়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল, এমনকি, চীনও বিপ্লবের পথে হাঁটা শুরু করল।

আজ এমন এক পরিস্থিতি এসেছে যে, ইংল্যান্ডে উদ্ভাবিত একটা যন্ত্র বছরখানেকের মধ্যে চীনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কর্মহীন করে দেয়।

বৃহদায়তন শিল্প এই ভাবে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একটা সম্পর্কের মধ্যে টেনে এনেছে। ছোট ছোট সমস্ত স্থানীয় বাজারকে জুড়ে দিয়েছে বিশ্ব-বাজারে, সভ্যতা আর প্রগতির পথ সুগম করেছে সর্বত্র। উন্নত দেশগুলির ঘটনা প্রবাহের দ্বারা যাতে দুনিয়ার সমস্ত দেশ প্রভাবিত হয় সেই ব্যবস্থা করেছে।

তাই আজ ইংল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সের শ্রমিকরা মুক্তি অর্জন করলে তা নিশ্চিত ভাবে বিশ্বের

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

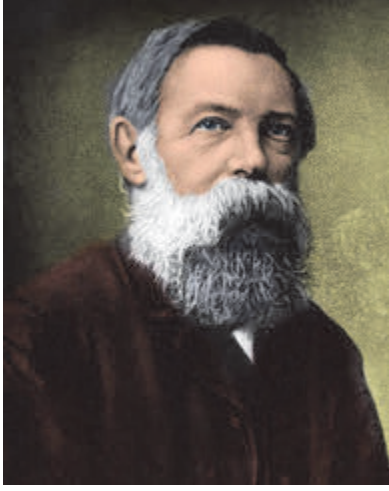
সমস্ত দেশের শ্রমিককে বিপ্লবের রাস্তা দেখাবে। আজ হোক আর কাল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত দেশের শ্রমিক মুক্তি অর্জনে সফল হবেই।

দ্বিতীয়ত, যেখানেই ক্ষুদ্র শিল্পকে হটিয়ে তার জায়গায় বৃহদায়তন শিল্প এসেছে, সেখানেই শিল্প বিপ্লব বুর্জোয়াদের উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছে। তাদের সম্পদ ও ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে গেছে, তাদের প্রধান শ্রেণি হিসাবে গড়ে তুলেছে। তার ফল হয়েছে, যেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে সেখানে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং উচ্ছেদ করেছে পূর্বতন সমস্ত শাসক শ্রেণি— অভিজাতকুলকে, গিল্ডের মনিবদের এবং এই দু’য়ের প্রতিভূ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে বংশানুক্রমে কুক্ষিগত করে রাখার অধিকারকে বাতিল করে এবং ভূমি-সম্পত্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য করে দিয়ে, উচ্চবর্গীয়দের সমস্ত বিশেষ অধিকার লোপ করে বুর্জোয়ারা অভিজাত এবং উচ্চবর্গীয়দের ক্ষমতা চূর্ণ করেছিল। গিল্ডগুলিকে এবং হস্তশিল্পীদের বিশেষ অধিকারকে লোপ করে বুর্জোয়ারা গিল্ড মালিকদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছিল। তাদের জায়গায় তারা এনেছিল অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে যে কোনও ব্যক্তির অধিকার রয়েছে তার পছন্দমতো শিল্পের যে কোনও শাখায় প্রবেশ করার। এ কাজে যার একবারে ন্যূনতম জায়গায়, যা সর্বহারাদের জীবনকে ক্রমাগত অসহনীয় করে তোলে। একদিকে সর্বহারাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং অন্যদিকে তাদের উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি সর্বহারার সমাজ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে তোলে।

অবাধ প্রতিযোগিতার প্রবর্তন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে দিল— এখন থেকে সমাজের সভ্যদের মধ্যে একটিমাত্র বৈষম্যই বিরাজ করবে, তা হল, তাদের হাতে সঞ্চিত পুঁজির পরিমাণের বৈষম্য। পুঁজিই হয়ে উঠল ক্ষমতার নির্ণায়ক শক্তি, তাই পুঁজির মালিক বুর্জোয়া শ্রেণিই হয়ে উঠল সমাজের সর্বপ্রধান শ্রেণি। বৃহৎ শিল্পের সূচনার সময়ে অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল প্রয়োজনীয় শর্ত, কারণ একমাত্র এই সামাজিক অবস্থার মধ্যেই বৃহদায়তন শিল্প বিস্তার লাভ করতে পারে।

অভিজাতবর্গ আর গিল্ড মালিকদের সামাজিক ক্ষমতা চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা চূর্ণ করল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও। সমাজে সর্বপ্রধান শ্রেণি হয়ে ওঠার সাথে সাথে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সর্বপ্রধান শ্রেণি হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করল। তারা এ কাজ করল প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই শাসনব্যবস্থার মূল অবলম্বন হল— বুর্জোয়া সাম্যের ধারণার ভিত্তিতে আইন ও অবাধ প্রতিযোগিতার আইনি স্বীকৃতি। ইউরোপের



দেশগুলিতে এই শাসনব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দেশে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজির মালিকেরাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র বুর্জোয়ারাই ভোটদানের অধিকারী। এই বুর্জোয়া ভোটাররাই ডেপুটিদের নির্বাচন করে, এবং এই বুর্জোয়া ডেপুটির কর দিতে অস্বীকার করার অধিকার প্রয়োগ করে

নির্বাচন করে একটি বুর্জোয়া সরকার।

তৃতীয়ত, শিল্প বিপ্লব যেমন বুর্জোয়াদের সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে সর্বহারাদের। যে-মাত্রায় বুর্জোয়াদের সম্পদবৃদ্ধি ঘটেছে, সেই মাত্রায় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে সর্বহারাদের। যেহেতু একমাত্র পুঁজিই সর্বহারাকে কাজে নিয়োগ করতে পারে, আবার পুঁজি কেবল তখনই বাড়তে পারে যখন সে নিযুক্ত করে শ্রম, তাই সর্বহারার বৃদ্ধি ঘটে ঠিক পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে। একই সঙ্গে শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়া এবং সর্বহারার উভয়কেই জড়ো করে বড় বড় শহরে, যেখানে শিল্প চালানো সবচেয়ে লাভজনক। একই জায়গায় এই বিপুল জনসমষ্টির একত্রিত হওয়ার ঘটনা সর্বহারাদের তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই ব্যবস্থা যত অগ্রসর হয়, তত বেশি করে উদ্ভব হয় শ্রম-সাম্রাজ্যকারী যন্ত্রের, যা ক্রমাগত উচ্ছেদ করে কায়িক শ্রমকে, ততই তা মজুরিকে নামিয়ে নিয়ে যায় একেবারে ন্যূনতম জায়গায়, যা সর্বহারাদের জীবনকে ক্রমাগত অসহনীয় করে তোলে। একদিকে সর্বহারাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং অন্যদিকে তাদের উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি সর্বহারার সমাজ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে তোলে।

প্রশ্ন : শিল্প-বিপ্লবের অন্যান্য ফলাফল কী ?

উত্তর : স্টিম ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে বৃহদায়তন শিল্প অতিদ্রুত এবং স্বল্প খরচে উৎপাদনকে সীমাহীন ভাবে বাড়িয়ে চলার উপায় আয়ত্ত করল। উৎপাদনের স্বচ্ছন্দতার কল্যাণে অবাধ প্রতিযোগিতা, যা বৃহদায়তন শিল্পের অবশ্যজ্ঞাবী ফল, তা অচিরেই চরম মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠল। বহুসংখ্যক পুঁজিপতি লেগে গেল শিল্পে, অল্প সময়ের মধ্যেই উৎপাদন হতে থাকল প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির উপায় থাকল না। ফলে দেখা দিল তথাকথিত এক বাণিজ্যিক সংকট। কল-কারখানা বন্ধ করে দিতে হল। সেগুলির মালিকেরা হল দেউলিয়া, শ্রমিকদের অন্ন ঘুচল। সর্বত্র ঘনিয়ে এল শোচনীয় দুর্দশা। কিছুকাল পরে উদ্ভূত উৎপাদন বিক্রি হল। কল কারখানাগুলি আবার চলতে শুরু করল, মজুরি বাড়ল, আগের চেয়ে

ব্যবসা-বাণিজ্যে এল তেজিভাব। কিন্তু বেশি দিন গেল না। আবার পণ্য উৎপন্ন হতে থাকল বড় বেশি, আরও একটা নতুন সংকট ছড়িয়ে পড়ল এবং আগেরটার পথেই তা এগোতে থাকল। এই ভাবে, এই শতাব্দীর (উনবিংশ) শুরু থেকে শিল্প পর্যায়ক্রমে কখনও বাড়বাড়ন্ত কখনও সংকটের আবর্তের মধ্যে ওঠা-পড়া করেছে অবিরাম। প্রায় প্রতি পাঁচ থেকে সাত বছর অন্তর নতুন সংকটের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা সব সময় বয়ে নিয়ে এসেছে শ্রমিকদের আরও অবর্ণনীয় দুর্গতি এবং একই সাথে নিয়ে এসেছে সর্বব্যাপক বৈপ্লবিক আলোড়ন, আর প্রচলিত পুরো ব্যবস্থার জন্য চূড়ান্ত বিপদ।

প্রশ্ন : পর্যায়ক্রমে ফিরে আসা এইসব বাণিজ্যিক সংকটের পরিণতি কী ?

উত্তর : প্রথমত, বৃহদায়তন শিল্প তার বিকাশের প্রারম্ভিক পর্বে নিজেই অবাধ প্রতিযোগিতার জন্ম দিলেও এই শিল্পের বৃদ্ধি এখন অবাধ প্রতিযোগিতার পরিধি ছাপিয়ে গেছে। একদিকে প্রতিযোগিতা অন্যদিকে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্পোৎপাদন বৃহদায়তন শিল্পের পায়ে বেড়ির মতো জড়িয়ে গেছে। এই শৃঙ্খলকে শিল্পের অবশ্যই ভাঙা চাই এবং তা সে ভাঙবেই। যত দিন বৃহদায়তন শিল্প বর্তমান ভিত্তিতে চলবে, তা চলতে পারে শুধু সাত বছর অন্তর-অন্তর পুনরাবৃত্ত সর্বব্যাপক বিশৃঙ্খল অবস্থার ভিতর দিয়ে। এই অবস্থা শুধু সর্বহারাদের চরম দুর্দশার আবর্তে ঠেলে দেয় না, একই সাথে তা ধ্বংস করে বিরাট সংখ্যক বুর্জোয়াকে এবং এর মধ্য দিয়ে তা বারে বারে বিপন্ন করে সমগ্র সভ্যতাকে।

ফলে সমাজকে হয় বৃহদায়তন শিল্প ত্যাগ করতে হবে, যা একেবারেই অসম্ভব, নইলে সমাজকে অনিবার্যভাবে সংগঠিত করতে হবে সম্পূর্ণ নতুন রূপে— যেখানে শিল্পোৎপাদন পরিচালিত হয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি-মালিকদের দ্বারা নয়, সমাজের প্রত্যেকের কথা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সমাজের দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন শিল্প এবং তার উৎপাদনবৃদ্ধির অসীম ক্ষমতা এমন এক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে যেখানে জীবনধারণের উপকরণগুলির উৎপাদনের প্রাচুর্য সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যকে পূর্ণতম মাত্রায় তার শক্তি ও সামর্থ্যকে বিকশিত করতে এবং যথার্থ স্বাধীন ভাবে তা প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়। সঠিক ভাবে বলতে গেলে, বৃহদায়তন শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য আজকের সমাজে যাবতীয় দুর্দশা আর বাণিজ্যিক সংকটের জন্ম দিচ্ছে, ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে এর সেই বৈশিষ্ট্যই এইসব দুর্দশা এবং বিপর্যয়কর ওঠা-পড়ার অবসান ঘটাবে।

এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে :

১। এখন থেকে সমস্ত সামাজিক অকল্যাণের জন্য সেই বিশেষ সমাজব্যবস্থা দায়ী বলে বুঝতে হবে, যে ব্যবস্থা সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২। একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে এই সমস্ত অকল্যাণ নিঃশেষে দূর করা সম্ভব।

(চলবে)

ইজরায়েলের গণহত্যার রক্ত

একের পাতার পর

রকমের অসামরিক স্থানে অবিরাম বোমাবর্ষণ, আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাকেও ত্রাণ বিলিতে বাধা দেওয়া, পানীয় জল, খাদ্য, ওষুধ থেকে শুরু করে সমস্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নষ্ট করে দেওয়া, পৌছানোতে বাধা দেওয়ার মতো মানবতাবিরোধী কাজ করে চলেছে ইজরায়েল প্রশাসন। তারা প্যালেস্টিনিয় জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করে দেওয়ার ঘোষণাও করেছে একেবারে খোলাখুলি। এই ঘোষণা এতটাই বর্বর, যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের দোসর হিসাবে তারা মধ্যপ্রাচ্যে একটার পর একটা দেশে হত্যাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই মার্কিন প্রেসিডেন্টও এক সময় তাদের থামতে বলতে বাধ্য হয়েছেন। গোটা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা তো বটেই এমনকি খোদ আমেরিকার বৃহৎ ইজরায়েলের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ হয়েই চলেছে। সম্প্রতি শেষ হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামেও বহু দেশের সমর্থকরা প্যালেস্টাইনের পতাকা তুলে ধরে ইজরায়েলের গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আইসিজি আদালত ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করেছে। অথচ এত কিছু পরেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতানিয়াহুকে ‘বিশিষ্ট বন্ধু’ এবং ইজরায়েলকে ভারতের ‘ফাদার ল্যান্ড’ বলে গদগদ হয়েছেন।

মোদিজির এত ইজরায়েল প্রীতির কারণ কর্মসংস্থানের নামে ভারত থেকে হাজার হাজার শ্রমিককে ইজরায়েলের যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করতে পাঠিয়ে দেশে বেকার সমস্যার সমাধানের ভণ্ড করা। এর থেকেও বড় হল ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অস্ত্র ব্যবসার বাজারকে সংহত করা। ইজরায়েলে যারা অস্ত্র পাঠাচ্ছে তার মধ্যে আছে আদানি গোষ্ঠী এবং ইজরায়েলের যৌথ উদ্যোগে চলা পিএলআর সিস্টেমস, আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড এয়ারোস্পেস লিমিটেড, ইন্দো মিম কোম্পানি, কল্যাণী স্ট্র্যাটেজিক সিস্টেমস, ভারত ফোর্জ, প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভস প্রভৃতি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মিউনিশন ইন্ডিয়া, অ্যাডভান্সড অপটেল ইত্যাদি সংস্থা। এই কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফা শুধু ইজরায়েলের যুদ্ধে হচ্ছে না, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে চলা ছোটখাট লড়াই থেকে শুরু করে অনেকগুলি যুদ্ধে খাটছে ভারতীয় কোম্পানির অস্ত্র। এই যুদ্ধাস্ত্র বিক্রিই মুমূর্ষু পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঞ্জীবনী সুধা।

ইজরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ চেরিল ডিসুজা সহ একাধিক আইনজীবী ও আইনের শিক্ষক বলেছিলেন, জেনোসাইড কনভেনশন (গণহত্যা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক আইন) ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী কোনও রাষ্ট্র গণহত্যা চালাচ্ছে বা চালাতে পারে এরকম সম্ভাবনা দেখলেই যে কোনও দেশের কর্তব্য— তার সাথে সমস্ত অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া। কোনও দেশ গণহত্যার খবর জেনেও অপরাধী দেশকে অস্ত্র সরবরাহ করলে তাকেও ওই দুষ্কর্মের শরিক হিসাবে গণ্য করা হবে। ভারত সরকারের অজানা নয় যে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস বা আইসিজি) ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসেই ফুল কোর্ট শুনানিতে

ইজরায়েলকে প্যালেস্টাইনে গণহত্যা চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এই আদালত প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের উপস্থিতিকে বেআইনি বলেছে। আন্তর্জাতিক আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ইজরায়েলের এই বেআইনি দখলদারিতে সাহায্য হয় এমন কোনও কাজ কোনও রাষ্ট্র করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক আদালত ওই রায়েই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, জেনোসাইড কনভেনশনের আর্টিকেল-৩ অনুসারে কোনও রাষ্ট্র অস্ত্র রপ্তানির মাধ্যমে গণহত্যার শরিক বনে গেলে তার অপরাধও গণহত্যাকারীদের মতোই শাস্তিযোগ্য। এই কনভেনশনের আর্টিকেল-১ অনুযায়ী সমস্ত রাষ্ট্র এই নিয়ম মেনে চলতে দায়বদ্ধ। শীর্ষ আদালত বিদেশনীতি এবং কোম্পানিগুলির ক্ষতির প্রশ্ন তুলে বিষয়টিতে ঢুকতে চায়নি। কিন্তু ওই আইনজীবীরা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন, যে কোনও অস্ত্রচুক্তির অবশ্যপালনীয় শর্ত থাকে কোনও ভাবে এই অস্ত্র গণহত্যা, শিশু হত্যা বা অন্য পথে অন্যায্য যুদ্ধে কাজে লাগানো যাবে না। এর সম্ভাবনা দেখা মাত্রই অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করতে রপ্তানিকারক কোম্পানির লাইসেন্স সাসপেন্ড করা সে দেশের সরকারের কর্তব্য। ঠিক এই কারণেই ইজরায়েলে অস্ত্র রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ভারত সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে (দ্য হিন্দু, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

প্রসঙ্গত, ‘স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ (সিপ্রি)-এর তথ্য অনুসারে ২০২৫-এর আগস্ট থেকে জার্মানি ইজরায়েলে অস্ত্র রপ্তানিতে রাশ টেনেছে। এর আগে ইটালি, স্পেন, কানাডা, জাপান, বেলজিয়াম, ব্রিটেন হয় অস্ত্র জোগানো বন্ধ করেছে অথবা তা নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইতালি সহ কোনও কোনও দেশ ৭ অক্টোবর ২০২৩-এর আগের অর্ডার ছাড়া ইজরায়েলের জন্য সব অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করে দিয়েছে (সিপ্রি, ৩ অক্টোবর ২০২৫, আলজাজিরা ২২ নভেম্বর, ২০২৪)। দুঃখের বিষয় বিশ্বে যে দুটি শক্তি গণহত্যার প্রতি চোখ বুজিয়ে থেকে অস্ত্র দিয়ে ইজরায়েলকে সাহায্য করে চলেছে তার একটি হল বিশ্বমানবতার অন্যতম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং আর একটি দেশ হল ভারত— যে আজ সাম্রাজ্যবাদের ছোট অংশীদার হিসাবে আমেরিকার সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে দেশে দেশে হানাদারের ভূমিকা পালন করছে। ভারতীয় জনগণ দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহ্য বহন করে এসেছেন। অথচ আজ অস্ত্র কোম্পানির মুনাফার স্বার্থে ভারত সরকার দেশের জনগণের ঘাড়ে গণহত্যার দোসর হওয়ার গ্লানি চাপিয়ে দিচ্ছে!

আর একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, ভারতীয় কোম্পানিগুলি ইজরায়েলকে যেমন অস্ত্র ও সরঞ্জাম বেচে, তেমনি নানা অস্ত্র, সামরিক ড্রোন ইত্যাদি সে দেশ থেকে আমদানিও করে। ইজরায়েল, আমেরিকা, ফ্রান্স সহ নানা দেশের অস্ত্রের লাইসেন্স নিয়ে তা ভারতীয় কোম্পানিগুলির কারখানায় উৎপাদন চলছে। সারা বিশ্বেই ভয়াবহ বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিপতি শ্রেণির সামনে এখন অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং অস্ত্র ব্যবসাই বাঁচার মূল রাস্তা। আন্তর্জাতিক পুঁজির অংশ হিসাবে ভারতীয় একচেটিয়া মালিকরাও এই অস্ত্র ব্যবসাকেই আঁকড়ে ধরে তাদের মুনাফা অটুট রাখতে চাইছে। সেই ব্যবসার ব্যালেন্স শিটে গাজার শিশুর রক্তের ছিটে লেগে থাকা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একটা পরিবার, রক্তের বন্ধনের চেয়েও গভীর এক বাঁধন

এসইউসিআই(সি) শুধুই কোনও দল নয়— মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের নিজের হাতে তিল তিল করে গড়া এক বিশাল পরিবার, যে পরিবার শেখায় কষ্টকে কী ভাবে হাসিমুখে জয় করতে হয়। সে দিনের যাত্রা ছিল সেই শিক্ষারই এক বৃষ্টি ও ঘামে ভেজা জীবন্ত ইতিহাস।

ছোট্ট একটা ১০৭ গাড়ি। তাতে আমরা ৩৫ জন। কোলে চারটে শিশু, তাদের মায়েরা।

এখানে একটা কথা বৃকের ভেতর থেকে বলতে হয়। ওই টানা দু’ঘণ্টা গাড়ির মধ্যে মায়েরা একটু বসবেন, সেটুকু জায়গাও ছিল না। ছোট ছোট শিশুগুলোকে বৃকে আঁকড়ে, ঘামে ভিজতে ভিজতে, একে অপরের গায়ে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। সবাই ঠাসাঠাসি করে গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছি।

বেলা সাড়ে এগারোটায় রওনা দিলাম। সমাবেশ আর কতদূর? আর কতদূর? অনেকের প্রশ্ন। অবশেষে যখন রানি রাসমণি রোডে পৌঁছলাম, তখন ২:২৫। এই দু’ঘণ্টা শুধু যাত্রা ছিল না, এ ছিল ভালবাসার পরীক্ষা। আদর্শের প্রতি ভালবাসা না থাকলে এই কষ্ট কেউ হাসিমুখে সহ্য করতে পারে না। তাই তো কারও মুখে একটাও অভিযোগ ছিল না। আমরা তো একই মায়ের সন্তান— কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের সন্তান।

বৃষ্টি ভেজা ময়দান যেখানে ভিজে যায় শরীর, ভেজে না মনোবল

ধর্মতলায় পা রাখতেই আকাশ ভেঙে পড়ল। মুখলধারায় বৃষ্টি। যে মায়েরা রোদ দেখে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা ছাতা আনেননি। কী করব?

কারও না কারও ছাতার তলায় শিশুদের ও মায়েদের দাঁড় করালাম, কারও মাথায় টেনে ধরলাম গাড়িতে বসার জন্য আনা প্লাস্টিকের চাদরটা।

বৃষ্টি একটু ধরতেই ছুটে গিয়ে বসলাম ময়দানের ভেজা চেয়ারে। যে বাচ্চাগুলো এতক্ষণ গরমে, ভিড়ে কুঁকড়ে ছিল, তারাই বৃষ্টির জল পেয়ে হাততালি দিয়ে হাসছে। ওদের হাসিতে আমাদের সব কষ্ট ধুয়ে গেল।

আবার বৃষ্টি নামল। এ বার আর কোনও আড়াল রইল না। ছাতা, প্লাস্টিক সব ব্যর্থ। আমরা, আমাদের চারপাশের হাজার হাজার মানুষ সবাই ভিজে একাকার। কিন্তু একজনও নড়ছে না। সামনে মঞ্চে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলছেন, আর ওই ভেজা জনসমুদ্র একাগ্রচিত্তে। সেই দৃশ্য দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল। এ আবেগ নয়, এ বিশ্বাস।

ফেরার পথে মাতৃহের সবচেয়ে বড় ছবি

সমাবেশ শেষ, আবার চল নামল বৃষ্টির। আমরা ভিজতে ভিজতে সেই খোলা গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি উপরে একটা ত্রিপল টাঙিয়ে দিলেন।

ভেতরে তখন এক অন্য পৃথিবী। মায়েরা নিজের ভেজা শাড়ির আঁচল দিয়েই মুছিয়ে দিচ্ছেন সন্তানের গা-হাত-পা। দ্বিতীয় কোনও জামা আনেননি তারা। তাই খালি গায়ে, মায়ের বৃকের ওমে লেপ্টে রইল শিশুগুলো। তাকিয়ে দেখলাম সেই মায়েদের মুখের দিকে। দু’ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আসা, তারপর এই অব্যবহৃত বৃষ্টিতে ভেজা। কিন্তু কোথায় বিরক্তি? কোথায় ক্লান্তি? কোথাও নেই। আছে শুধু এক অদ্ভুত প্রশান্তি, এক তৃপ্তির হাসি। কষ্টের মধ্যেও কী পরম শান্তিতে হাসছেন সবাই! মনে হচ্ছিল, এটাই তো আমাদের পরিবার! ওই হাসি নিয়েই আমরা বাড়ি ফিরলাম। পরের দিন যখন ফোনে শুনলাম আমাদের সঙ্গে যাওয়া প্রত্যেক বাচ্চা, প্রত্যেক মা সুস্থ আছে, ভাল আছে, তখন মনে হল এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে!

— এক সংগঠকের কলমে



মায়ের আঁচলের তলায়

খড়াপুরে বাসস্ট্যান্ডের হাল ফেরাতে দাবিপত্র যাত্রীদের

খড়াপুর শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এই বাসস্ট্যান্ড ব্যবহার করেন। অথচ কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয় নেই। নেই পানীয় জল ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচালয় কিংবা সময়সূচি লেখা বোর্ড। প্রকাশ্যে মদ ও মাদকের রমরমা। এর প্রতিবাদে নিত্যযাত্রী, দোকানদার, চালক-কর্মচারীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ‘খড়াপুর বাসস্ট্যান্ড উন্নয়ন কমিটি’র পক্ষ থেকে ১১ আগস্ট মহকুমা শাসকের কাছে বাসস্ট্যান্ডের উন্নয়ন সংক্রান্ত ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মহকুমা শাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। এখন দেখার প্রতিকার কী করেন! প্রতিনিধিদলে ছিলেন গৌরীশঙ্কর দাস, ভাস্কর পাতর এবং শম্ভু কুইলা।

রাজ্যে রাজ্যে উদযাপিত ৫ আগস্ট

৫ আগস্ট এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক ও এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষের ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল দেশ জুড়ে। ২৩টি রাজ্যের রাজধানী শহরে জনসভা ছাড়াও প্রতিটি রাজ্যেই জনবহুল স্থানগুলিতে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, তাঁর স্মরণে রচিত সঙ্গীতের মাধ্যমে স্মরণ অনুষ্ঠান হয়।

ঝাড়খণ্ড : ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য



রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু (ছবি : ইনসেট)। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক স্বপন চ্যাটার্জী সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লি : মহান নেতা স্মরণে ৯ আগস্ট দিল্লিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য সত্যবান (ইনসেট)। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য আর



কে পরাশর। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক প্রাণ শর্মা, গিরওয়ার সিং, ম্যানেজার চৌরাসিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বিহার : 'সাম্প্রতিক জেন-জি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনজীবনের ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের জয় আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে, নির্বাচন নয়, বরং আন্দোলনই দান্তিক সরকারকে মাথা নত করতে পারে'। দলের বিহার রাজ্য কমিটির ডাকে ৫ আগস্ট পাটনার আইএমএ হলে অনুষ্ঠিত মহান নেতার স্মরণসভায়



এ কথা বলেন প্রধান বক্তা, পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য (ইনসেট)। তিনি বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী ধারার সৈনিক শিবদাস ঘোষ ১৯৪৭ সালেই উপলব্ধি করেন, দেশ রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হলেও জনসাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আজও স্বাধীন নয়। সেই স্বাধীনতা পেতে জনজীবনের সমস্ত সমস্যার মূল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়ম করা প্রয়োজন।

সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য সম্পাদক অরুণ কুমার সিং। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ। যন্তরমন্তরে ছাত্র-যুব আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতা, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও শিক্ষা সংস্থাগুলির স্বাধিকার হরণের বিরুদ্ধে সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন রাজ্য কমিটির সদস্য

সাধনা মিশ্র। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

আসাম : প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে গুয়াহাটি জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে সমাবেশ হয়। দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড কান্তিময় দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো



সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী (ইনসেট)। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুরতজামান মণ্ডল।

কর্ণাটক : ব্যাল্লারের গুণ্ডুরাও অডিটোরিয়ামে ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল শিবদাস ঘোষের ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী। দলের কয়েকশো কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত



সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য কে রাধাকৃষ্ণ (ছবি)। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কে উমা এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কে সোমশেখর। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্যরা।

মহারাষ্ট্র : নাগপুরে দলের দফতরে ৯ আগস্ট উদযাপিত হল সর্বহারার মহান নেতা শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা। সভাপতিত্ব করেন দলের নাগপুর সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক বিজেন্দ্র



রাজপুত। প্রধান বক্তা ছিলেন গুজরাট সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক মীনাক্ষী যোশী (ছবি)।



ওড়িশা : রাজধানী ভুবনেশ্বরে সর্বহারার মহান নেতা শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা উদযাপিত হয় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য স্বপন ঘোষ (ছবি)। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক

শঙ্কর দাশগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছবি মহান্তি।

ত্রিপুরা : রাজধানী আগরতলায় ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম হলে ৫ আগস্ট স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মলিন দেববর্মা। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ত্রিপুরা



রাজ্য সম্পাদক অরুণ ভৌমিক বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মানব বেরা (বাঁ-দিকের ছবি) বলেন, দুনিয়াজোড়া প্রবল সংকট থেকে বাঁচতে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রনায়করা দেশে দেশে ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে, প্রতিবাদীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সচেতন সংগঠিত তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করা ছাড়া পথ নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি দিল্লির কৃষক আন্দোলন ও সাম্প্রতিক ছাত্র-যুব আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। মহান নেতার দেখানো পথে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে সচেতন সংগঠিত গণআন্দোলন দেশ জুড়ে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

রাজস্থান : জয়পুরের লুনিয়াবাসে ১৬ আগস্ট উদ্বোধন হল শহিদ বিসমিল-আসফাক মেমোরিয়াল হলের। উদ্বোধন করেন দলের পলিটবুরো সদস্য সত্যবান। উদ্বোধনের পর ওই হলেই এ দিন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজস্থান সাংগঠনিক

কমিটির সম্পাদক রামদয়াল সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সত্যবান।

চণ্ডীগড় : দলের চণ্ডীগড় ইউনিয়ন টেরিটরি প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে মোহালির ভগৎ সিং ভবনে ৭ আগস্ট শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।



কমিটির সম্পাদক অমিত কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য সত্যবান (ছবি)।



মধ্যপ্রদেশ : মহান নেতা শিবদাস ঘোষ স্মরণে ৭ আগস্ট ভোপালের গান্ধী হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভোপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, সাগর, উজ্জয়িন, দেওয়াস, গুনা, আলিরাজপুর, জবলপুর এবং অশোকনগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ এই সভায় যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন রচনা আগরওয়াল। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ সিং (ইনসেট)। তিনি

বলেন, আজ দেশের যেখানেই নিপীড়ন ও শোষণ বাড়ছে, সেখানেই মানুষ তার বিরুদ্ধে লড়ছে। এসইউসিআই(সি) বিপ্লবী আদর্শকে সামনে রেখে গণআন্দোলনগুলিতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক প্রতাপ সামল বলেন, যন্তরমন্তরে সংগ্রামরত দেশের ছাত্র-যুবদের ওপর পুলিশ নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। যারা নিজেদের অধিকারের জন্য আওয়াজ তুলছে, তাদের সম্মান ও দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে। তবুও দেশের ছাত্র-যুবরা সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে গণআন্দোলনের শক্তি তীব্রতর করা প্রয়োজন।

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ : পোর্টব্লেয়ারে ১৩ আগস্ট শ্রীবিজয়াপুরামে উদযাপিত হয় ৫ আগস্ট। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

কমরেড অশোক কুমার সামন্ত (ছবি)। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বলরাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন শতাধিক মানুষ।

পাঠকের মতামত

এ খেলা কল্যাণকর নয়

বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেন এক অদ্ভুত ও সুবিধাবাদী সঙ্গীতআলেখ্য পরিবেশিত হচ্ছে। যে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুসংকরণ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে প্রধান হাতিয়ার বানিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে, তারাই আজ তসলিমা নাসরিনের মতো ব্যক্তিস্বাভাব্য ও মুক্তচিন্তার প্রবক্তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পিছপা হচ্ছে না। যে উগ্র রাজনীতি সমাজে অহিযুক্ততার অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করে, আজ সেই শক্তির হাতেই তথাকথিত ‘মুক্তচিন্তার’ তোষামোদী ঘৃতাঙ্কুর স্পষ্ট।

শাসক ও কায়মি স্বার্থাশ্রমী রাজনীতির চরিত্র অত্যন্ত কৌশলী। কোন নীতি এদের মূল চালিকাশক্তি আর কোনটা কেবলই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতার ক্ষুধা মেটানোর টোপ তা উন্মোচিত হওয়া জরুরি। কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের অন্ধতা, কুসংস্কার বা মৌলবাদের সমালোচনা করা আর সেই ধর্মাবলম্বী সমস্ত মানুষকে ঢালাও আক্রমণ করা এক কথা নয়। ঠিক তেমনই উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করা মানে কোনও ধর্মকে আক্রমণ করা নয়। কিন্তু বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর দরকষাকষির বাজারে এই ন্যূনতম নীতি ও নৈতিকতার স্থান নেই। সেখানে বিক্রি হয় তোষামোদ, উগ্রতা এবং সংকীর্ণ ভোটব্যংকের হিসাব-নিকাশ।

এক সময় নীতিহীন রাজনীতির শিকার হয়ে লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা ত্যাগ করতে হয়েছিল। আজ তাঁকেই রাজনৈতিক মুনাফা হাসিলের সুবিধার্থে সংবর্ধনার পাত্রী বানানো হচ্ছে। কারণ পুঁজিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে এখন ধর্মীয়মেরুসংকরণের বাজারদর তুঙ্গে। অন্য দিকে, এই উগ্র রাজনীতির দ্বিমুখী চরিত্র তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার দোহাই দিয়ে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়িয়ে একজন ক্রীড়াবিদ মুস্তাফিজুর রহমানকে বয়কটের রাজনীতি দেখা যায়, আবার রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী একই দেশের তসলিমাকে পরম সমাদরে আসন পেতে দেওয়া হয়।

এই অবস্থান কোনও নৈতিক মূল্যবোধ বা নীতির লড়াই নয়। এটা হল উগ্র মতাদর্শকে তোষণ করে শ্রমজীবী মানুষের মগজে কৃত্রিম ‘শত্রু ও মিত্র’ তৈরি করার চতুর বুর্জোয়া রাজনীতি। এর একমাত্র লক্ষ্য, দেশের সাধারণ মানুষকে ধর্মভিত্তিক মেরুসংকরণের নির্দিষ্ট খোঁয়াড়ে পুরে ফেলা, যাতে তাদের জীবনের আসল সমস্যা, রুটি-রুজির আন্দোলন এবং শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে বিভক্ত করা যায়।

এদের ভণ্ডামি এখানেই থেমে থাকে না। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাকেই এরা ব্যবহার করুক না কেন, একই সমাজে যখন কোনও বিবেকবান ও মুক্তমনা হিন্দু ব্যক্তিত্ব—গৌরী লঙ্কেশ, গোবিন্দ পানসারে কিংবা কালবুর্গীর মতো মানুষেরা এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সামনে আয়না তুলে ধরেন, তখন তাঁদের বুকে বুলেট বসিয়ে চুপ করিয়ে দিতেও এই উগ্র শক্তিসমূহ দ্বিধা করে না! এদের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট, আয়না যতক্ষণ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে, ততক্ষণ ভাল। আর সেই আয়নায় নিজেদের কুৎসিত মুখ ভেসে উঠলেই তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও।

প্রকৃতপক্ষে, ওপার বাংলায় জামায়াতে ইসলামীর মতো ধর্মীয় মৌলবাদী দলগুলি যেমন নিজেদের গোটা মুসলিম সমাজের একমাত্র কাণ্ডারী বলে দাবি করে আসলে সংকীর্ণ ধর্মীয় ব্যবসা পরিচালনা করে, এপারে আরএসএস-বিজেপিও একই ভাবে হিন্দুধর্মের স্বঘোষিত ঠিকাদার সেজে সামাজিক বিভাজন তৈরি করছে। মৌলবাদী শক্তি যে ভাবে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ভয় ও আবেগকে মূলধন করে ফায়দা লোটে, একই ভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তিও সাধারণ মানুষকে ক্ষমতার দাবা খেলার বোড়ে বানিয়ে রাখছে।

এই খেলা শেষ পর্যন্ত কোনও ধর্মের কল্যাণ বা প্রগতির নয়। এটি হল শাসক শ্রেণির সেই সুস্পষ্ট চক্রান্তের সুতো, যার মাধ্যমে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সাধারণ মানুষের চোখ বেঁধে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখছে। এই ভণ্ডামি ও সাম্প্রদায়িক মেরুসংকরণের বিরুদ্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক ও শ্রেণিভিত্তিক চেতনার বিকাশই হতে পারে সাধারণ মানুষের একমাত্র উত্তর।

মিজানুর রহমান
মুর্শিদাবাদ

নাগাল্যান্ডে বন্যাদুর্গতদের জন্য চিকিৎসাশিবির

বন্যাবিধ্বস্ত নাগাল্যান্ডে টিজিট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও নেতাজি মেমোরিয়াল কমিটি : নর্থ-ইস্ট চ্যাপ্টারের যৌথ উদ্যোগে একটি বিনামূল্যের চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হল ১০ আগস্ট। ডাঃ চিত্রলেখা দাস, ডাঃ শাহরিয়ার আলম ও ডাঃ বিক্রম মণ্ডল সহ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ১৬০ জন বন্যাপীড়িত মানুষের চিকিৎসা করেন। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্টজন।



পাঁচ বছরে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা বেড়েছে ৩০০ শতাংশ

ভারতে গত পাঁচ বছরে বেড়েছে শত কোটিপতি বা বিলিওনেয়ারের সংখ্যা। দু-পাঁচ জন নয়, বেড়েছে ৩০০ শতাংশ হারে। ২৭ জুলাই সংসদে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরও জানিয়েছেন, ২০২৫-২৬ (ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার) মূল্যায়ন বছরে বিলিওনেয়ারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৭৬, ২০২৪-২৫ এ যা ছিল ৪১৫।

মন্ত্রীর মুখে এই তথ্য শুনে চমকে উঠছেন অনেকেই। ভাবছেন, গ্লোবাল হান্সার ইনডেক্স-২০২৫ এ ১২৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান যেখানে ১০২, যে দেশে বেকারত্বের হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে, অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা মানুষের মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে, সেই দেশে ধনকুবেরদের সংখ্যা এত বেড়ে চলেছে কী ভাবে?

বিজেপি সরকার যুক্তি দিচ্ছে, করব্যবস্থার আমূল সংস্কার অর্থাৎ আয়করে ছাড়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে স্টার্ট আপ খোলার ব্যাপারে সরকারি সহায়তা—ইত্যাদি কারণে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, শিল্পে উৎসাহ ভাতা হিসেবে ২০২৩-২৪-এ সরকার কর মকুব করেছে ৮৬,৮১০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৬-এ কর মকুবের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৯৮,০৯৫ কোটি টাকা। একই সময়ে শিল্পপতিদের উৎসাহ ভাতা হিসাবে প্রত্যক্ষ আয়করে ছাড় দেওয়া হয়েছে ১,৫২,০০৬ কোটি টাকা। পরের বছর দেওয়া হয়েছে ১,৭১,৭৬৩ কোটি টাকা।

কিন্তু দেশের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে? বাস্তবে কর্মসংস্থানের হাল কেমন, বেকারত্বের দশাই বা কী? শ্রমমন্ত্রী বিপুল কর্মসংস্থানের দাবি করলেও জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য বলছে, মে মাসে বেকারত্বের হার ৫.৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে, যা গত ১১ মাসে সর্বোচ্চ। এপ্রিলেও বেকারত্বের হার ছ’মাসের রেকর্ড ভেঙে ৫ শতাংশের উপরে ছিল (আনন্দবাজার পত্রিকা-৫ আগস্ট)। কেন্দ্রীয় সরকারের ছোট-মাঝারি শিল্পমন্ত্রীর বয়ান অনুযায়ী, ২০২৩-২৪, ’২৪-২৫, ’২৫-২৬ মোট তিন বছরে মাঝারি ছোট শিল্প বন্ধ হয়েছে মোট ১.৩৩ লক্ষ। প্রতি শিল্পে গড়ে ১০ জন কর্মী কাজ হারালে মোট কাজ হারিয়েছেন ১৩ লক্ষ কর্মী। কর্মসংস্থান দূরের কথা, শিল্পে বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় নতুন নিয়োগ কমছে, কর্মী ছাঁটাই বাড়ছে। সরকারের সাফল্য দেখাতে গিয়ে সংসদে অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ২০২২ সালে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের বেকারত্বের হার ছিল ৩.৬ শতাংশ, তা ২০২৫-এ হয়েছে ৩.১ শতাংশ।

হাওড়ায় এ আই এম এস এস সম্মেলন

১৯ জুলাই হাওড়া ময়দানের মারিয়াজ ডে স্কুলে ৭০ জনের বেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মহেশ জয়সওয়াল বক্তব্য রাখেন। ধারণ, খুন, হকার উচ্ছেদ, মদ ও পর্নোগ্রাফির প্রসারের বিরুদ্ধে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড রীতা ঘোষাল। সমর্থনে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বরুনা জানা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সভানেত্রী কমরেড কানন বেরা এবং

অথচ ২০২২-২৩ সালের কাজের বাজারের সমীক্ষা দেখাচ্ছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ যুবক-যুবতী অর্থাৎ ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের বেকারির হার ১৮.৪ শতাংশ, গ্র্যাজুয়েট ২৯.১ শতাংশ, মাস্টার্স ৪০ শতাংশ, এমবিএ ৪৬ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট ৬০-৬৫ শতাংশ। এই সমীক্ষার সাথে মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যানের ফারাক বিস্তর।

সরকারি রিপোর্টই বলছে, কাজের সন্ধানে শিক্ষিত যুবকরা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিযায়ী হয়ে যাচ্ছেন। এর সাথে রয়েছে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজনা পাওয়ার বিষয়। ১৫-২৯ বছরের এমন যুবকেরা রয়েছে যারা পড়াশোনাও করেনি, কোনও কাজও করে না। অর্থনীতিতে এদের বলা হয় ‘নিট’ (নেট ইন এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট অর ট্রেনিং)। এদের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা আরও সহজ। আশঙ্কার বিষয় হল, ২০১২ সালে ‘নিট’দের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি, ২০২০-তে ১০ কোটি ছাড়িয়েছে। এ সব থেকে পরিস্কার, শিক্ষাব্যবস্থা, কাজের বাজার ও আর্থিক কাঠামো দেশের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে।

জনগণের বড় অংশের যখন এমন দুরবস্থা, তখন শত কোটিপতির সংখ্যা বাড়ল কী করে? আসলে গরিবদের ওপর শোষণের খড়গ চাপিয়েই বাড়ি ধনীর সম্পদ। আর তাদের সহায়তা করে শাসক দলগুলি। ফলে বেড়ে চলে ধনকুবেরদের সংখ্যা। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মেই আর্থিক বৈষম্য পাহাড়প্রমাণ হচ্ছে। এক দিকে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের ধনসম্পদ উপচে পড়ছে, অন্য দিকে দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তারা বেঁচে থাকার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এ-বেলা ও-বেলার সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ সমাজের বৃহত্তর অংশের শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ওপর শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর করছে। বাড়ছে ধনী-গরিবের আর্থিক বৈষম্য।

এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবাদাস শাসক দলগুলি জনগণের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় বসে। পরে ভোল পাণ্টে যে পুঁজিপতি শ্রেণির বদান্যতায় তারা ক্ষমতায় বসেছে তাদের স্বার্থে কাজ করতে শুরু করে। দেশের বৃহত্তর অংশের অর্থাৎ মেহনতি মানুষের দারিদ্র, বেকারত্ব, দুর্দশা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা থাকে না। তাই দারিদ্রপীড়িত দেশের মানুষের সামনে সংসদে দাঁড়িয়ে ধনকুবেরদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের এতটুকু লজ্জাবোধ হয় না।

জেলা সম্পাদিকা কমরেড পুতুল চৌধুরী। কমরেড পুতুল চৌধুরীকে সভানেত্রী, কমরেড রিতা ঘোষালকে সম্পাদিকা এবং কমরেড বেবি দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে জেলা কমিটি ও জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

শেষে সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মন্থা নন্দ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্যায়া-অত্যাচার ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সম্মেলন পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মিতা হোড়।

রাঁচি উত্তাল ছাত্র-যুব আন্দোলনে

একের পাতার পর

পুলিশের হুমকি, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস কিংবা জলকামান— কিছুই আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের পিছু হটাতে পারেনি। বরং প্রতিটি বাধার পর আন্দোলন ব্যাপকতর হয়েছে। দাবি একটাই— নিয়োগ পরীক্ষার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নিয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি ও কালো তালিকাভুক্ত সংস্থার হাতে পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

আন্দোলন শুরু হওয়ার পর দূর-দূরান্তের ছাত্রছাত্রীরা, কোচিং সেন্টার, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের যুবক-যুবতীরা ক্রমশ এসে জড়ো হতে থাকেন স্টেডিয়ামের ধরনা মঞ্চের বিক্ষোভ সমাবেশে। তাঁদের বুকে একই যন্ত্রণা— পরিশ্রম করে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র ফাঁস, অনিয়ম কিংবা দুর্নীতির কারণে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ হয়ে পড়া। বছরের পর বছর চলেছে এই দুর্নীতি। একের পর এক সরকার পাশেটছে, কিন্তু অবস্থা বদলায়নি। শেষ পর্যন্ত সহ্যের সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেছে রাজ্যের চাকরিপ্রার্থী তরুণ-তরুণীদের। তাঁরা এই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান চান। চান শুধু তাঁদের নয়, আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরও যেন এই যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়।

আন্দোলনের পাশে পরিবার, সাধারণ মানুষ

দিন যত এগিয়েছে, আন্দোলনের চরিত্রও বদলেছে। শুধু পরীক্ষার্থী নয়, অভিভাবকরা, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, আদিবাসী সমাজের মানুষও ধরনা মঞ্চে আসতে শুরু করেন। প্রতিদিন অভিভাবকেরা নিজের হাতে রান্না করা খাবার নিয়ে হাজির হয়েছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পাশাপাশি এমন বহু আদিবাসী ও নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষও আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যাঁদের নিজের সন্তান হয়তো এখনও পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেনি। তাঁরা বলছেন, আজকের নিয়োগ দুর্নীতি যদি বন্ধ না হয়, আগামী দিনে তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎও নিরাপদ থাকবে না।

বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিরোধ

আন্দোলন চলতে চলতেই ধূর্ত শাসক শ্রেণি ও তাদের মদতপুষ্ট নানা গোষ্ঠী প্রতিবাদীদের বিভাজিত করার চেষ্টা করে। একটি সংবাদমাধ্যমের এক সাংবাদিক আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়ে বিভাজনমূলক বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তিনি যন্তরমন্তরের আন্দোলনকে দেশবিরোধী আখ্যা দিলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং স্পষ্ট জানান, তাঁদের আন্দোলনের মূল বিষয়— চাকরি, স্বচ্ছ নিয়োগ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি নয়। প্রতিরোধের মুখে পড়ে ওই সাংবাদিক আন্দোলনস্থল ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। বাস্তবে এই আন্দোলনকে ধর্ম, জাতি বা পরিচয়ের প্রশ্নে ভাগ করে দেওয়ার অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের লড়াই ছাত্রসমাজ।

সরকারের সঙ্গে আলোচনা ও দাবি আদায়

ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার আলোচনায় বসে এবং আন্দোলনকারীদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সরকার ১৪তম জেপিএসসি পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। ২০২৩ ও ২০২৫ সালের জেপিএসসি-জেএসএসসি ব্যাকলগ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা টিডিপিএল-এর বিরুদ্ধে তদন্তের ঘোষণা হয়েছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অভয় তিয়ারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। এই সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই আন্দোলনের সাফল্য। কিন্তু একে আংশিক সাফল্য হিসেবেই দেখছেন রাঁচির আন্দোলনকারীরা। তাই লড়াই তাঁদের থামেনি। কারণ সিজিএল সহ অন্যান্য বিতর্কিত পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। আন্দোলনকারীদের আরও দাবি, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করতে হবে এবং নিয়োগ

প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করতে হবে।

চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন থেকে সর্বস্বান্ত হওয়ার যন্ত্রণা

প্রথম দিন থেকেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক ছাত্র বিবেক পণ্ডিত জানানেন, বাবা-মা অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার দুর্নীতি তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তাই যত বাধাই আসুক, আন্দোলন থেকে এক মুহূর্তের জন্য সরে যেতে রাজি নন বিবেক। বললেন, “আন্দোলন ছাড়া সামনে আর কোনও পথ নেই।”

গিরিডির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এক ছাত্রী চোখের জলে বললেন, চাকরিটা না পেলে অসুস্থ বাবা-মায়ের চিকিৎসা করানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। এই ব্যক্তিগত কান্নাগুলিই ক্রমে একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রশ্নে পরিণত হয়ে আন্দোলনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশি হামলাকে চ্যালেঞ্জ করে ঐতিহাসিক মিছিল

১০ আগস্ট পুরনো বিধানসভা থেকে নতুন বিধানসভা ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় বিশাল মিছিল। হাজার হাজার ছাত্র-যুব, চাকরিপ্রার্থীরা তো ছিলেনই, বহু মহিলা, বৃদ্ধ, সাধারণ মানুষও এতে অংশ নেন। মিছিল এগোতেই পুলিশ বাধা দেয়। ৬টি ব্যারিকেড ভেঙে আন্দোলনকারীরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে চলেন। ঝাড়খণ্ড পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস চালিয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে চায়। কিন্তু আন্দোলনকারীদের রোখা যায়নি। তাঁরা পুলিশের বাধা পার হয়ে বিধানসভা চত্বরে ঢুকতে সক্ষম হন।

আন্দোলন গড়ে ওঠার ইতিহাস

ঝাড়খণ্ড পৃথক রাজ্য হওয়ার পর থেকেই জেপিএসসি সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির যে অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে, তার বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও বারবার সোচ্চার হয়েছে। এ বারের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এআইডিএসও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তুলতে এবং আন্দোলনকে ধারাবাহিক রূপ দিতে সংগঠনের ব্যানার ছেড়ে শত শত ছাত্রকর্মী লাগাতার ভাবে যুক্ত থেকে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ধরনা মঞ্চ থেকে এআইডিএসও ঝাড়খণ্ডরাজ্য কমিটির সহসভাপতি আশীষ কুমার বলেছেন, “এটি কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট সরকারের সমস্যা নয়, এটি একটি নীতির প্রশ্ন। যতদিন এই নীতির পরিবর্তন না হবে, ততদিন এই ধরনের দুর্নীতি চলতেই থাকবে।” দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের ঘটনাগুলির উল্লেখ করে তিনি ছাত্র আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাঁচির শিক্ষা : জয় এসেছে আন্দোলনের রাস্তাতেই

এই আন্দোলনের দিকে ফিরে তাকালে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ছাত্রদের দাবিগুলি সরকারের আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে পারার পিছনে রয়েছে পুলিশের বাধা, জলকামান, টিয়ার গ্যাস, পরিবারের উদ্বেগ ও হাজারো অসুবিধা উপেক্ষা করে হাজার হাজার ছাত্র-যুবকের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অদম্য প্রত্যয়। কিন্তু রাঁচির এই আন্দোলনের প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়। যে সমাজে একটি চাকরির জন্য মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবারের বহু বছরের সঞ্চয়, বাবা-মায়ের স্বপ্ন এবং তরুণ-তরুণীদের কঠিন পরিশ্রম জড়িয়ে থাকে, সেখানে নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতিকে নিছক প্রশাসনিক অনিয়ম বলা যায় না। এ হল কার্যত জীবনের উপর আঘাত। সেই কারণেই জয়পাল সিং মুণ্ডা স্টেডিয়াম হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের প্রতীক। এই আন্দোলন দিল্লির যন্তরমন্তরে সদ্য ঘটে যাওয়া অসমসাহসী আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে।

রাঁচির ধরনা-মঞ্চ থেকে প্রতিটি জেলা, শহর, গ্রাম, কলেজ ও কোচিং সেন্টারে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান উঠেছে। কারণ, দীর্ঘস্থায়ী অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ছাত্র আন্দোলন। রাঁচির রাজপথ সেই শিক্ষাই আবার সামনে এনেছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে এই অঙ্গীকার নিয়েই রাঁচি এখনও সংগ্রামমুখর।

নাগরিকত্ব নিয়ে নয়া তামাশা

একের পাতার পর

আবার দেশের মাটিতে ফেরার দিন গুনছেন।

ফলে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে, কিসের ভিত্তিতে কেউ প্রমাণ করবেন তিনি ভারতের নাগরিক? এ সংক্রান্ত কোনও দলিল বা কার্ড রাষ্ট্র কি তার নাগরিকদের দিয়েছে?

নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতে এক নতুন তামাশা শুরু হয়েছে। এখন এক একটা সরকারের এক এক রকম ফরমানে দেশের মানুষের হাতে হরেক রকমের কার্ড। কিন্তু এর কোনটা যে নাগরিকত্বের নিশ্চিত প্রামাণ্য দলিল— তা কেউই বলছে না। মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি থেকে রাষ্ট্রপতি— কারও কোনও বাণী শোনা যাচ্ছে না কোন কার্ডটা নাগরিকত্বের প্রমাণ!

আইন অনুসারে প্যান কার্ড (পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট নম্বর) করতে পারেন একমাত্র ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ বলছেন, প্যান কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।

রেশন কার্ড? নিয়ম অনুযায়ী কেবল ভারতীয় নাগরিক রেশন সামগ্রী পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু খাদ্য দপ্তর বলছে রেশন কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।

ভোটার কার্ড? জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ অনুযায়ী প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক, যার ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর, সে ভোটাধিকারের যোগ্য। কিন্তু ভারতের নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ভোটার কার্ড একমাত্র ভোট দেওয়ার সার্টিফিকেট। এটা নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।

আধার কার্ড? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এত ঢাকঢোল পিটিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেশব্যাপী আধার কার্ড অভিযান করলেন। সমস্ত পরিষেবার সঙ্গে এর সংযুক্তিও করানো হল। ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে শুরু করে অনলাইন সব কর্মকাণ্ডে এর সংযোগ। এখন সুপ্রিম কোর্ট এবং বিধিবদ্ধ আইন বলছে এটা নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এটা ব্যক্তির পরিচয় মাত্র। তাহলে পাসপোর্ট? বিদেশমন্ত্রক বলছে, এটা বিদেশ ভ্রমণের ছাড়পত্র, নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। নিয়মানুযায়ী একমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে কার্ডগুলি কেবল ভারতীয় নাগরিকরা পেতে পারেন, সেই কার্ডগুলিকে নাগরিকত্বের প্রমাণ ধরা হচ্ছে না।

জন্ম সার্টিফিকেট কি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়? এরও উত্তর ধাঁধায় ভরা। আমাদের দেশে ১৯৬৯ সালের আগে জন্ম সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। জন্ম সার্টিফিকেট ধরলে প্রবীণরা তো প্রথমেই বাদ! তা হলে? কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট? না, ওটা নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। জমির দলিল? না, ওটা সম্পদের মালিকানার সার্টিফিকেট।

তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারই স্পষ্ট করে বলুক, কোনটা নাগরিকত্বের প্রমাণ? দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা কোন নাগরিকত্বের প্রমাণের ভিত্তিতে ওই চেয়ারে আসীন? কেউ বলতে পারবেন না। স্বাধীনতার আগে দেশনেতারা বলেছিলেন, স্বাধীন ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী যে কোনও ব্যক্তি, যিনি অন্য দেশের নাগরিক নন, তাঁকেই নাগরিকের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অথচ বিজেপি সরকার এই নাগরিকত্ব নিয়েই সবচেয়ে বেশি জটিলতা তৈরি করে চলেছে। সমস্ত সমস্যা থেকে মানুষের চোখ সরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্বের জটিলতায় ফেলে চাপে রাখাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। প্রশ্ন উঠেছে সরকারের নৈতিকতা নিয়েও। অনুপ্রবেশ আটকানোর ছল করে দেশের নাগরিকদের বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সন্দেহভাজন বলে দাগিয়ে দেওয়া এবং সন্দেহ নিরসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই নাগরিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চূড়ান্ত অযৌক্তিক শুধু নয়, চরম স্বৈরাচার। নাগরিকত্বের শংসাপত্র দেওয়ার দায় নাগরিকের নয়, রাষ্ট্রের। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে কোনও রাষ্ট্র নাগরিককে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। নাগরিকদের কল্যাণই তার কর্তব্য, এক সময় বলতেন রাষ্ট্রের কর্তারা। সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের হয়রানি করাই আজ যেন সরকারের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে।

অসমে বিজেপি সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক ৫টি বামপন্থী দলের

অসমের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার রাজ্যের জনগণের মতামতকে পদদলিত করার জন্য একের পর এক স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। এর তীব্র নিন্দা করে পাঁচটি বামপন্থী দল এসইউসিআই(সি), সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই(এম-এল) এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অসম রাজ্য কমিটি ১২ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেছে,

এই সরকার কৃষকের জমির অধিকার রক্ষার আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে আদিত্য কুমার রাভা, প্রণব দোলে সহ ৬ জনকে কারারুদ্ধ করে। পরে আদালত তাঁদের জামিনে মুক্তি দিলেও, প্রণব দোলেকে সরকার পুনরায় এনএসএ-র অধীনে গ্রেপ্তার করে জেলবন্দি করে। স্যাটেলাইট টাউনশিপ স্থাপনের অজুহাতে জনজাতীয় কৃষকদের জমি কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি সরকার। এর বিরোধিতা করার জন্যই আন্দোলনকারীদের ওপর এনএসএ-র মতো কালা আইন ব্যবহার করতেও তারা দ্বিধা করছে না।

বিবৃতিতে দলগুলি বলেছে, এই স্বৈরাচারিক

ফ্যাসিবাদী সরকার রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাজকর্ম সঙ্কুচিত করতে পরিকল্পিত ভাবে নেমে পড়েছে। রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ করার জন্য ২ হাজার টাকা জমা দিয়ে আবেদন করার অদ্ভুত নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। সামান্য অজুহাতে সভা-সমাবেশ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সভা-সমাবেশের অনুমতি না দিলেও আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া ২ হাজার টাকা ফেরত পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপি সরকার গুয়াহাটি শহরে মিটিং-মিছিল করা, এমনকি পোস্টার লাগানোও নিষিদ্ধ করছে। এই স্বৈরাচারিক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে দলগুলি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের ওপর মিথ্যা মামলা দিয়ে ভীতির পরিবেশ তৈরি করছে বিজেপি সরকার। বন্যাত্রাণের জন্য সাহায্য সংগ্রহেও নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে তারা। অথচ সরকার ত্রাণকাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছে পাঁচ বামপন্থী দল।

ঝাড়খণ্ডের খনিতে রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ১২ আগস্ট বিনা আলোচনায় সংসদে খনি এবং খনিজ সম্পদ (বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। এর ফলে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ জমি ও খনিজ উত্তোলনের জন্য রাজ্যগুলি আর সেস, কর বা অন্য লেভি দাবি করতে পারবে না। এমনকি বকেয়াও আর রাজ্যগুলি চাইতে পারবে না।

এসইউসিআই(সি)-র ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী এর তীব্র বিরোধিতা করে ১৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, খনি শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বিপুল মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই আইন এনেছে বিজেপি সরকার। এর ফলে ঝাড়খণ্ডের মতো গরিব রাজ্য বিশাল আর্থিক ক্ষতির

সম্মুখীন হবে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরেও এই আইন একটি আঘাত। এই আয়ের ওপর ভিত্তি করে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ৫১ লাখ মহিলাকে সরকার ভাতা দিত। টাকার অভাবে এখন তা বন্ধ হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রাপ্য জিএসটি সহ অন্য বকেয়াও দিচ্ছে না।

তিনি বলেন, ২০২৪-এ সুপ্রিম কোর্ট খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ জমি ও তার উত্তোলনের জন্য রাজ্যের প্রাপ্য সেস ও করকে রাজ্যের ন্যায্য অধিকার বলেছিল। বিজেপি সরকার গায়ের জোরে আইন এনে সেই অধিকার খর্ব করল। এই আইন বাতিল করার দাবি জানিয়ে ঝাড়খণ্ডবাসী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বাঁকুড়া ইন্ডাস থানার করিশুনডা গ্রামের শেখ আবদুল হাফিজকে ১৫ আগস্ট বিজেপি-র দুষ্কৃতীরা নৃশংস ভাবে হত্যা করে। ঘটনায় তীব্র খিঙ্কার জানিয়ে ১৭ আগস্ট রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে এআইডিএসও (ছবিঃ বাঁকুড়া)। এসইউসিআই(সি) জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ওই দিন দোষীদের শাস্তি ও মৃতের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে ইন্ডাস থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সহমতিতা জানান কমরেডস অসিত মণ্ডল, অঞ্জলী নন্দী, স্বপন নাগ, লীনা ঘোষ, হরলাল মণ্ডল প্রমুখের একটি প্রতিনিধিদল।



বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস স্মরণে ১২ আগস্ট দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ওই দিন দলের কেন্দ্রীয় অফিস সহ সমস্ত পার্টি অফিসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।



আসামে ভয়াবহ বন্যা আতঁদের সাহায্যে সাধারণ মানুষ

আসাম রাজ্যে বন্যা নতুন কিছু নয়। প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। তবু সরকার আজ পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করেনি। উজানি আসামের মানুষ বন্যার ভয়াবহতার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক যে বন্যা অর্থাৎ গত ১৯ জুলাই আসামের শিবসাগর, রাজদেও, যোরহাট, গোলাঘাট জেলা সহ নাগাল্যান্ডের মন জেলার যে বন্যা, তা কোনও প্রাকৃতিক কারণে নয়।

সচেতন মহল একে বলছেন, মানুষের তৈরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই মানব সৃষ্ট বন্যা হয়েছে অবৈধভাবে কয়লা খনন, দিখৌ নদী থেকে নির্বিচারে পাথর, বালি খনন করে ব্যবসা চালানোর ফলে। কিন্তু আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আসামে কোথাও কয়লা নেই। কয়লার খননকাজ আসামে হয় না। বাস্তবে আসামের বিহ্বর চন্টক অঞ্চল সহ অনেকগুলি জায়গাতেই কয়লা আছে। অবৈধ ভাবে কয়লা খনন ও পাথর খননের কাজ বহু দিন ধরেই চলেছে। সেখানকার মানুষ দাবি তুলেছিল, খনন কাজ বন্ধ করার। কিন্তু প্রশাসন তাতে কর্ণপাতও করেনি। মানুষ বুঝেছিল, এর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা বলে মানুষকে ভোলানোর চেষ্টা করছেন।

এই মানব সৃষ্ট প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। বন্যা এত ভয়াবহ ছিল যে দু-ঘণ্টার মধ্যে মানুষের ঘরবাড়ি, খেত, কৃষি, গৃহপালিত পশু থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র— সব শেষ হয়ে গিয়েছে। দেখা গেছে, নানা দল, সংগঠন, ব্যক্তিগত

ভাবে মানুষ বন্যারতদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজেরা গিয়ে বন্যাপীড়িত লোকের ঘরবাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। এনডিআরএফ-এসডিআরএফ সরকারি কর্মীরা যেখানে যেতে সাহস করেনি, সেখানে সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। কয়েক জন মানুষ দু-দিন ধরে ঘরের চালের উপরে আটকে ছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

ত্রাণের জন্য বন্ধ কালেকশন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পরিস্থিতি এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অথচ আসামের মানুষ জানেন, প্রথম সাতদিন বন্যার্ত এলাকায় সরকারি কর্তৃপক্ষের দেখা মেলেনি। সরকারি ত্রাণও মেলেনি। এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে যখন ত্রাণ সংগ্রহ শুরু হয়েছে মানুষ দু-হাত ভরে সাহায্য করেছেন। এক এক জন ব্যক্তি পাঁচ বার, ছ-বারও সাহায্য করেছেন। বলেছেন, আমরা আগে সাহায্য করেছি, আবার দিলাম। দেখা গেল, সমাজে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটলেও তা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণ— মানুষ সত্যিই মানুষের জন্য। এক মহিলাকে সাহায্যের আবেদন করতে তিনি বললেন, এই দুর্দশার মধ্যে সাহায্য না করে কী ভাবে থাকব? প্রচণ্ড গরমে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে দেখে অনেকেই ঠাণ্ডা জলের বোতল কিনে দিয়ে গেছেন। মানুষের ভিতর এখনও সহানুভূতিশীল, সুন্দর মন আছে। সেটাকে জাগানোই বিপ্লবী দলের কর্মীদের কাজ।

পশুপক্ষী হাট চালুর দাবিতে বিক্ষোভ পূর্ব মেদিনীপুরে

পশুপক্ষী হাট চালু করা ও রাস্তায় পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র দিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা 'পশুপক্ষী হাট বাঁচাও কমিটি'। ২৯ জুলাই কয়েকশো পশুপাখি ব্যবসায়ী ও গো-পালক নিম্নোক্ত হাইরোড মোড় থেকে মিছিল করে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে বাঁচাতে অবিলম্বে গরুর হাটগুলি চালু করতে হবে। জেলার গরুর দুটি বড় হাটের সঙ্গে হাজার হাজার গো-পালক ও ব্যবসায়ী যুক্ত। তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে কাজ নেই, চাষাবাদ অলাভজনক। ফলে বিপুল সংখ্যায় মানুষ পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। রাজ্যের বিজেপি সরকার এই



হাটগুলি বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁরা বিপদে পড়েছেন।

বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, অতি দ্রুত হাটগুলি চালু করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করতে হবে। রাজ্য পশুপক্ষী হাট বাঁচাও প্রস্তুতি কমিটির নেতা দিলীপ কুণ্ডুর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে ওসি স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন বলে জানান।